বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

সুব্রত রায়চৌধুরী

আশির দশক থেকে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে, এই সময় পর্বে বাংলার তরুণ-তরুণীদের একট বড়ো অংশ যেমন সমাজবদলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে তেমনি একটি বড়ো অংশ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাকে আশ্রয় করে সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হয়েছে। মূলত তরুণ কবিরাই পকেটের পয়সা খরচ করে চার পাতা, আট পাতার ট্যাবলয়েড বা এক ফর্মা বা দু'ফর্মার পত্রিকা বের করতেন। সে সময়ের তরুণ-তরুণীরা কাঁধে ঝোলা ব্যাগ ব্যবহার করতেন। সেই ঝোলাতেই থাকত তাদের সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা। ২ টাকা থেকে ৫ টাকার বিনিময়ে সেসব পত্রিকা তাদের প্রিয়জনদের কাছে বিক্রি করতেন, কখনো উপহার দিতেন। কখনো বা পঁচিশে বৈশাখে সেসব পত্রিকা নিয়ে ভোররাতে চলে যেতেন জোড়াসাঁকোয়। বিক্রি করাটা বড়ো নয়, পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার আকুলতাই তখন বড়ো ছিল, সেই ধারা আশি-নব্বই পেরিয়ে একবিংশ শতকেও আমরা লক্ষ করি। বলা যায় বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বাঙালির অহংকার। এক একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর ভালোবাসা নিয়ে উদ্যোক্তারা লেখক থেকে ছাপাখানা, ছাপাখানা থেকে পাঠকের কাছে ছুটে বেড়ান তা ভাবা যায় না।

তরুণদের এই উৎসাহকে মর্যাদা দেবার জন্য এই শতাব্দীর শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে নন্দন চত্বরে শুরু হল বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ঘর-গেরস্থালি নিয়ে শুধু সম্পাদক নন, সাহিত্যপ্রেমী মানুষ, এমনকি সরকারও উৎসাহী হলেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, কবি, লেখককে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা হল। ক্ষুদ্র-পত্রিকার একেবারে আপনজন সন্দীপ দত্তের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রান্তে লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা গড়ে উঠল। এ সবই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পক্ষে খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছবি। এ ছবি যে-কোনো ভাষা-ভাষী মানুষের কাছেই ঈর্ষণীয়।

এত প্রাপ্তির মধ্যেও বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে আমরা অনুভব করলাম লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনে তলে তলে একটি প্রতিস্রোত বইতে শুরু করেছে। দেখা গেল বিগত শতাব্দীর ৭০-৮০ বা ৯০-এর দশকে যে কাব্যচর্চার উন্মাদনা ছিল সে সময়ের তরুণদের মধ্যে, সেই উৎসাহে ভাটা পড়তে

শুরু করেছে। ফলে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংখ্যা অনেকটাই কমতে শুরু করে। অন্যদিকে পুরোনো বেশ কিছু পত্রিকারও অকালমৃত্যু ঘটল। যেমন আমি যেখানে থাকি সেটা কলকাতা নয়; তবে কলকাতার নিকটবর্তী মফস্সল একটি শহর। ৯০-এর দশকে এই শহর থেকে ২৩টি পত্রিকা বের হত। প্রায় গোটা দশক জুড়েই তারা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু আজ এই ২০১৫-তে বেঁচে আছে মাত্র ৩টি পত্রিকা। বাকি সবগুলিই ২০০১–০২-এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যে তিনটি পত্রিকা বেঁচে আছে তার একটি পারিবারিক পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় দশ বছর। ভালোভাবে হাঁটতে পারেন না। স্বভাবতই পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। দ্বিতীয়টির প্রকাশক একটি ট্রাস্ট। কাজেই অর্থ চিন্তা খুব একটা নেই। একসময় ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশ পেত এখন বের হয় বছরে একটা, পুজোর মুখে। ট্রাস্টের সবাই ষাটোর্ধ, দু-একজন বাদে কেউই এ বিষয়ে উৎসাহী নন, তৃতীয় পত্রিকাটি সম্পাদনা করি আমি নিজে। এখনও নিয়মিতই বের হয়। তবে একটা কথা বলতেই হয় বহু পত্রিকাই ১০–২০ এমনকি ৩০ বছর চলার পরেই যথার্থ উত্তরসুরির অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্রিকাগুলি সম্পাদকের ব্যক্তি উদ্যোগের ফসল, সময়ের নিয়ম মেনে সম্পাদক যখন সামর্থ হারিয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন তখন পরবর্তী প্রজন্ম বহুক্ষেত্রেই আর এগিয়ে আসেন না। এভাবেই বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছি 'অতএব ভাবনা', 'উত্তরসূরি' বা 'শিস'-এর মতো এককালের নামকরা বহু পত্রিকা।

বিগত দশ বছরে একদা নিয়মিত বহু পত্রিকাকে যেভাবে বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছি সেভাবে নতুন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ দেখিনি। আমি ১০০ পত্রিকার উপর একটা র‍্যানডাম সার্ভে করেছিলাম, দেখা গেছে গত ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এমন পত্রিকার সংখ্যা শতকরা ১৫টি। অথচ বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে ছবিটা এরকম ছিল না। আবার এই নতুন ১৫ শতাংশ পত্রিকা যাঁরা সম্পাদনা করছেন তাঁদের গড় বয়স ৫৩ বছর। অর্থাৎ তরুণ প্রজন্ম নতুন পত্রিকার সঙ্গে লগ্ন হতে যতটা আগ্রহী সম্পাদনায় ততটা আগ্রহী নন। দেখা গেছে নতুন পত্রিকা অর্থাৎ যেসব পত্রিকা গত পাঁচ বছরে প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পাদকদের মাত্র ১৪ শতাংশের বয়স ৩০ বা তার নীচে। অথচ আমরা যদি ইতিহাস খুঁজি তবে দেখব সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৩০ বছর বয়সে 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু ২৭ বছর বয়সে বের করেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকা, মাত্র ২৮ বছর বয়সে দীপক মজুমদার সম্পাদনা করেছেন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। অর্থাৎ বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের তিন-তিনটি স্মারকফলকই তৈরি করেছিলেন যে তরুণেরা একবিংশ শতাব্দীতে সেই

তরুণেরাই আজ হঠাৎ প্রতিস্রোতে ভেসে চলেছেন। কিন্তু কেন এমন হল? এ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের আজকের সমস্যা আর সম্ভাবনার দিক।

একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে চারটি স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ— প্রথমত উদ্যোগ, দ্বিতীয়ত অর্থ, তৃতীয়ত লেখা, চতুর্থত বিপণন।

একটা সময় ছিল যখন তরুণেরা বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হবার আগেই কবিতা লেখায় হাত পাকাতেন। খুঁজে বেড়াতেন কবিতা ছাপার নতুন মাধ্যম। শুনেছি কবি শামসুর রহমান সুদূর ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার দপ্তরে কবিতা পৌঁছে দেবার জন্য। কবিতা লেখায় যেমন আগ্রহী ছিলেন তেমনি কলেজে পড়তে পড়তেই নতুন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও করে ফেলতেন। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। সাহিত্যচর্চা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না— এই মর্মসত্যটি আমাদের চারপাশের সমাজ, বিশেষত আমাদের অভিভাবকেরা এমন করে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন তরুণ প্রজন্মের মাথায় যে তারা এখন কেরিয়ার নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কবিতা লেখার অবকাশ যদি বা মেলে পত্রিকা সম্পাদনার মতো ঝামেলার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। আবার সৃজনশীল কিছু তরুণ বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন ব্যান্ড, ড্যান্স ইত্যাদি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যমকে। আবার কেউ কেউ রিয়েলিটি শো-এর উপযুক্ত হয়ে উঠতে চাইছেন। পত্রিকা প্রকাশের বদলে এইসব ক্ষেত্রে নিজের শিল্পকে অনেক বেশি রসিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হল। ফলে পত্রিকাবিমুখ হয়ে উঠছেন তরুণ প্রজন্ম। তবে সাহিত্যচর্চা যে তাঁরা করছেন না, তা নয়। গানের জগতে যে নতুন কথা শোনা যাচ্ছে তার অনেকটাই কিন্তু এই তরুণ প্রজন্মের লেখা। তবে পত্রিকা প্রকাশের ঝামেলা তাঁরা অনেকেই এড়িয়ে চলতে চাইছেন। তুলনামূলকভাবে প্রবীণরা অনেকেই অন্য কোনো শিল্প-মাধ্যমকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি বলেই থেকে গেছেন ক্ষুদ্র পত্রিকার জগতে। তাছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে যে পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, এখানে তা হয় না। কাজেই খানিকটা ভালোবেসে, খানিকটা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে এবং খানিকটা নিজের সৃষ্টিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার তাগিদেই ক্ষুদ্র-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী ভূমিকা নেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃস্বার্থ কিছু মানুষ।

তবে বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ৬০–৭০-এর দশক পর্যন্ত সময়কালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যে লক্ষ্য, আদর্শকে সামনে রেখে কাব্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই ধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা একালে দেখা যাচ্ছে না।

পত্রিকার চরিত্র, লেখা নির্বাচনের পদ্ধতি বা কোনো দায়বদ্ধতা থেকে পত্রিকা সম্পাদক পত্রিকা সম্পাদনা করছেন সে বিষয়ে কোনো পূর্ব ঘোষণা একালের কোনো পত্রিকাতেই প্রায় দেখা যায় না। সেকালে পত্রপত্রিকায় কী ধরনের পূর্ব ঘোষণা থাকত তা বোঝাতে আমরা 'পরিচয়', 'কৃত্তিবাস' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকার কথা ভাবতে পারি। যেমন 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৫৬-র জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় ১৭টি ঘোষণা লক্ষ করি। পত্রিকাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—

> ধনবাদী সভ্যতার শেষ সংকটের এই চরম পর্যায়ে পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত। ইতিহাস আজ প্রত্যেক মানবপ্রেমিককে প্রশ্ন করিতেছে, আপনি কোন পক্ষে আছেন? আপনি কি মৃত্যুপথযাত্রী ধনবাদ-ফ্যাসিবাদের শিবিরে, না নবজীবনের জয়গানে মুখর সমাজবাদের শিবিরে? বাংলাদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিককে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

ঘোষণাপত্রে আরও লেখা হয়—

> বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দুইয়েরই পূর্ণ সমন্বয় ঘটে সমাজবাদী বাস্তবতায়। এই সমাজবাদী বাস্তবতার পথেই সাহিত্য ও শিল্পকে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের অষ্টাদশ সংকলনে ঘোষণা করে—

> আধুনিক সাহিত্যের পাঠককে জানাবার প্রয়োজন হচ্ছে, কৃত্তিবাস ক্ষুধার্ত বা কামার্ত রচনার সংকলন নয়। জড়ত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে সাহিত্যে কখনো কখনো বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়, গত দশবছর ধরে কৃত্তিবাস প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস, স্তিমিত কবিত্বের ঘন রস থেকে বাংলা কবিতাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, উত্তেজনা দিয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। নগ্নতার উচ্চারণ মাত্র যেমন শিল্প কলুষিত হয় না, তেমনি কিছু কুৎসিত অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করলেই কবিতা আধুনিক হয় না।

কিংবা ১৯৬৩-তে চৈত্র সংখ্যায় সম্পাদক ঘোষণা করেন—

> কৃত্তিবাস হল তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বীটনিক, ভয়ংকর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা।

এর দু'বছর বাদে ১৯৬৮-তে 'শ্রুতি' নামক একটি পত্রিকার ঘোষণাপত্রেও কবিতা সম্পর্কে তাঁদের সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখি। তাঁদের ঘোষণাপত্রে তাঁরা লিখেছেন—

কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ
কবিতা কারিগরি নির্মাণ নয়, শিল্পসৃষ্টি
কবিতা বক্তৃতা বা প্রচার নয়, নিবিড় অভিজ্ঞতা
কবিতা বুদ্ধির চমক নয়, ব্যাকুল সন্ন্যাস।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে পত্রিকাগোষ্ঠী বা সম্পাদক মশাইয়ের তরফ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা প্রথমেই পাঠককে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। ফলে কবি বা লেখকেরা তাঁদের স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পত্রিকা বেছে নিতে পারতেন তাঁদের আত্মপ্রকাশের জন্য। বর্তমানের ছবিটা কিন্তু এমন নয়, কবিরা পত্রিকা নির্বিচারে ছুটে গেছেন সম্পাদকের কাছে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়। সম্পাদকমশাইও অনেকক্ষেত্রেই শুধু ভালোলাগা-মন্দলাগার বিচারে কবিতা মনোনীত করছেন। পত্রিকা অত্যন্ত ছোটো হলেও তাকে কেন্দ্র করেই ক্ষুদ্র লেখকগোষ্ঠীও তৈরি হচ্ছে। তবে 'বঙ্গদর্শন', 'কল্লোল', 'কবিতা' বা 'কৃত্তিবাস'-এর মতো লেখকগোষ্ঠী এঁরা তৈরি করতে পারেনি। কারণ যে আন্তরিক অনুপ্রেরণায় শক্তি, সুনীলরা একদিন কৃত্তিবাসকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন সেই আন্তরিক তাগিদ এখনকার কবি-লেখকেরা তাঁদের কবিসত্তার ধাত্রীমাতা পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুভব করেন না। সম্পাদকের দুঃখ-কষ্ট, ঘর-গেরস্থালি কীভাবে চলছে তা জানতে এঁরা খুব একটা আগ্রহী নন। অনেকক্ষেত্রেই সম্পাদকমশাই চল্লিশটি পত্রিকার সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক ৩ জন, অন্যদিকে শতকরা ২৮টি পত্রিকার সদস্য সংখ্যা ১০-এর বেশি। তবে সদস্য সংখ্যা যতই হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকার সম্পাদককেই ব্যয়ভার বহন করতে হয়। উদ্যোগ বা ভালোবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি নির্ভর হয় বলে বাকি সদস্যরা অনেকেই পত্রিকা চালানোর বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েন। ফলে অপুষ্টিতে ভরা কৃশকায় কিছু ক্ষণজীবী পত্রিকার জন্ম হয়। পত্রিকার স্থায়িত্ব ও প্রচার বাড়াবার স্বার্থে সম্পাদকেরা কখনো কখনো কবি সম্মেলন বা মাসিক সাহিত্য বাসরের ব্যবস্থা করে থাকেন। ক্ষুদ্র পত্রিকাকেন্দ্রিক এইসব আড্ডায় পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কতটা হয় তা জানি না তবে কবি-লেখকদের একটি পারস্পরিক জানা-বোঝার জগৎ তৈরি হয়। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কবি লেখকেরা পত্রিকা পেতে যতটা আগ্রহী পত্রিকা কেনার ক্ষেত্রে ততটাই অনাগ্রহী, কাজেই সাহিত্যের আড্ডা বসিয়েও যে পত্রিকা সম্পাদকের মুখে খুব একটা হাসি ফোটে তা বলা যায় না।

ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতাদের একটা ভূমিকা থাকে। তবে ছোটো পত্রিকায় নামি-দামি শিল্পসংস্থা বা সরকারি বিজ্ঞাপন খুব একটা দেখা যায়

না। বেসরকারি বিজ্ঞাপনও এইসব ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠী কম পান, কাজেই আর্থিক সংকট মেটাতে সম্পাদক বা পত্রিকাগোষ্ঠীকে বিক্রির উপর নজর দিতেই হয়। কিন্তু পাঠক যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে পত্রিকা কেনেন এমন খুব একটা ঘটে না। যা বিক্রি হয় তা সবই চেনা-জানা লোকের হাতে গছিয়ে দেওয়া, মূলত পাঠকের অনীহার কারণেই গল্প, কবিতা ও নানারকম সাহিত্যকার্য পূর্ণ এইসব ক্ষুদ্র পত্রিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘজীবী হতে পারে না।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একটা দিগন্ত যদি ক্ষুদ্র-পত্রিকা হয় তবে অন্য দিগন্তে রয়েছে বড়ো পত্রিকা। এই বড়ো পত্রিকাগুলিও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের শ্রেণিভুক্ত। তবে আকার-আকৃতি, দাম— এসব নানা দিকের কথা বিচার করে এ জাতীয় লিট্‌ল ম্যাগাজিন বলতে চান না। কিন্তু বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বড়ো আকারের লিট্‌ল ম্যাগাজিন বিশেষত শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে বের হতে থাকে। 'পরিচয়' পত্রিকার তিন-চারশো পাতার শারদ সংখ্যাগুলি এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এ জাতীয় পত্রিকার সংখ্যা ৯০-এর দশক থেকে বাড়তে শুরু করেছে। ক্ষুদ্র-পত্রিকার পাশে এ জাতীয় বড়ো পত্রিকাগুলির প্রোডাকশন কোয়ালিটিই শুধু নজর কাড়ল না, সেই সঙ্গে এই জাতীয় পত্রিকাগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যও মানুষকে আকর্ষণ করতে থাকে। আকার আয়তনে বড়ো এই পত্রিকাগুলি এখন আর শুধুমাত্র সদ্য লিখতে শেখা তরুণ-কবির কাব্যচর্চার সূতিকাগার হিসাবেই থাকল না, তা হয়ে উঠল চিন্তাশীল বাঙালির সুগভীর মননের ফসল, কবিতার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, অনুবাদের মতো বহু বিচিত্র বিষয়ে চর্চা শুরু করল এই পত্রিকাগুলি। বলা ভালো বাঙালির এত বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানানুসন্ধান উনিশ শতকের পর এই প্রথম দেখা গেল। তার মানে এই নয় বিশ শতকে এই প্রবণতা থেকে বাঙালি একেবারেই বিচ্যুত হয়েছিল, আসলে জ্ঞানচর্চার এত ব্যাপক বিস্তৃত উদ্যোগ বিশ শতকের প্রথমার্ধে খুব একটা দেখা যায়নি। বাঙালি যে শুধুমাত্র কাব্যচর্চাতেই কালক্ষেপ করে না, সেও যে গভীর চিন্তন-মননের উপাসক তা এ জাতীয় পত্রিকার পাতা ওল্টালেই বোঝা যাবে। চরিত্র বিচারে এই পত্রিকাগুলিকে আক্ষরিক অর্থে লিট্‌ল ম্যাগাজিন বলা যায় না। কিন্তু বাণিজ্যিক পত্রিকাও এরা নয়। বরং বলা যায় প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বড়ো পত্রিকা, এতটাই বড়ো যে পাঁচ-ছয়শো পাতার পত্রিকাও এখন নজরে পড়ে। এ জাতীয় পত্রিকার সম্পাদককে পত্রিকা বিক্রির জন্য পাঠকের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয় না, বিষয়-বৈচিত্র্যের গুণেই পত্রিকাগুলি পাঠক খুঁজে নেন। এসব ক্ষেত্রেও যে সম্পাদক সদস্যদের খুব বেশি সহযোগিতা পান তা নয়। অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবেই তাঁরা

তিনশো-চারশো পাতার একটি পত্রিকার জন্য কম-বেশি ৪০/৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন, মূলত বিক্রি এবং কিছুটা বিজ্ঞাপনদাতাদের দাক্ষিণ্যে এই পত্রিকাগুলি চলে। পত্রিকাগুলির দামও ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির চেয়ে অনেকটাই বেশি। কম বেশি ১৫০ থেকে ৩০০ এমনকি ৪০০ টাকাতেও পত্রিকাগুলি বিক্রি হয়।

এ প্রসঙ্গে বড়ো পত্রিকাগুলির আর একটি প্রবণতার কথা উল্লেখ করতে হয়। গত পায় বিশ বছর ধরে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের অনেকটা একটা নতুন পথ বেছে নিয়েছেন। তা হল অনেক পত্রিকাই এখন বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংখ্যা যেমন হয় তেমনি বিশেষ বিষয়ভিত্তিক সংখ্যাও হয়। যেমন 'দশদিশি' পত্রিকা বের করেছে ব্রাহ্ম সমাজ বিষয়ক সংখ্যা, 'লোক' পত্রিকা বের করেছে বাংলার হাট বা শ্মশান বিষয়ক সংখ্যা। মিউজিক থেরাপি নিয়ে কাজ করছে 'তাঁতঘর একুশ শতক'। ওদের বাঁশি সংখ্যাটিও অসাধারণ সংখ্যা হয়েছে। কলকাতায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিক্রয়স্থল হিসাবে কলেজস্ট্রিটের পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, এনবিটি এবং কফি হাউসের দোতলার বই-চিত্র পরিচিত স্থান, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে এসব জায়গায় এই বিশেষ সংখ্যাগুলিকেই গুরুত্ব দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। গল্প-কবিতা-ফিচার বা প্রবন্ধ মিশ্রিত পাঁচমেশালি পত্রিকাগুলির তুলনায় এজাতীয় পত্রিকা বেশি বিক্রি হয় বলেই বিক্রেতারা এজাতীয় গুরুত্ব দেন। পাঠকের এই ঝোঁক লক্ষ করেই সম্পাদকেরা বিশেষ সংখ্যার দিকে ঝুঁকেছেন। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পত্রিকাব চরিত্রও বদলে যায়। যেমন 'তাঁতঘর একুশ শতক' পত্রিকাটি প্রথম অবস্থায় ছিল সম্পূর্ণ একটি কবিতার কাগজ। সম্পাদকমশাই নিজেও কবিতাই লিখতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি সম্পূর্ণতই একটি প্রবন্ধের পত্রিকা হয়ে উঠেছে। আসলে কবিতাপ্রেমী পাঠকের তুলনায় সিরিয়াস প্রবন্ধের পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি। বিশেষত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকেরা নিজেদের প্রয়োজনেই এজাতীয় পত্রিকা সংগ্রহে রাখতে চান, ক্ষুদ্র-পত্রিকা তাঁদের এ প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাই পত্রিকার বাজারে এজাতীয় পত্রিকার কাটতি বেশি। এজাতীয় পত্রিকাগুলির অর্থনৈতিক ভিতটাও খুব একটা নড়বড়ে নয়। বস্তুত একেবারেই তরুণেরা এজাতীয় পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন না। যাঁরা করেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ একটি সংখ্যা প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪০/৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করবার সামর্থ তাদের কাছে। তাছাড়া এজাতীয় পত্রিকাগুলি অনেকক্ষেত্রেই প্রচুর টাকার বিজ্ঞাপন পান। সম্পাদকেরা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ বলে তাঁদেরও অনেকের পক্ষেই সরকারি বা বেসরকারি

বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এসব পত্রিকার বিক্রি ততটাই ভালো যে পত্রিকা প্রকাশের টাকা অনেকক্ষেত্রেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উঠে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র-পত্রিকাগুলি যেখানে অর্থের অভাবে ধুঁকছে বা অপুষ্টিতে অকাল মৃত্যু ঘটছে সেখানে এই জাতীয় বৃহদাকার প্রবন্ধ পত্রিকাগুলি অনেকেরই বয়স ১০ বছর পেরিয়ে গেছে। এঁরা অনেকেই শুধু লেখকগোষ্ঠী নয় নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর তৈরি করেছেন। পাঠক নির্দিষ্ট কিছু পত্রিকা প্রকাশের অপেক্ষায় বসে থাকেন। পত্রিকার প্রকাশে বিলম্ব হলে সম্পাদকের কাছে খোঁজ খবরও নেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদকেরা যে পাঠকগোষ্ঠীর অভাব বোধ করেন এজাতীয় পত্রিকার ক্ষেত্রে সে অভাব থাকে না। এই পত্রিকাগুলি বাণিজ্যিক পত্রিকা না হলেও এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এঁদের ধর্ম হলেও ধীরে ধীরে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জগতে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানভূমি রচনা করেছে। এসব পত্রিকা বাণিজ্যিক কাগজগুলোর মতো লেখককে পয়সা দেন না। তবে বিষয় অনুযায়ী তাঁরা একটি লেখক প্যানেল তৈরি করে নেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট সময় এবং শব্দসংখ্যাও বেঁধে দেন। অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিটি স্তরেই থাকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এজাতীয় পরিকল্পনা ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি না। প্রায় কোনো সংগঠন ছাড়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইসব পত্রিকা প্রকাশ পেলেও এঁরা কিন্তু খুব একটা অর্থকষ্টে ভোগেন না। ক্ষুদ্র-পত্রিকার মতো 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়'-এর মতো আর্থিক অবস্থা এঁদের নয়, বরং এইসব পত্রিকাগুলি অনেকটাই স্বচ্ছল। পত্রিকার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও যথেষ্ট ভালো। কোনো কোনো পত্রিকা ২৫/৩০ এমনকি ৪০ পাতারও বিজ্ঞাপন পান, কাজেই বাণিজ্যিক কাগজের মতো এইসব পত্রিকারও খরচের প্রায় পুরো টাকাটাই উঠে আসে বিজ্ঞাপন থেকে। অনেক পত্রিকা পত্রিকা-প্রকাশকের পাশাপাশি প্রকাশনা জগতেও ঢুকে পড়েছেন, এঁদের অনেকেই নিজস্ব পত্রিকা দপ্তর খুলেছেন। সেখানে মাইনে দিয়ে সর্বক্ষণের লোকও নিয়োগ করেন তাঁরা। আর এইসব জানার পরও যখন দেখি কলকাতা বইমেলা বা লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলায় যে মধ্যবয়সী মানুষটি ৪ পাতা বা ৮ পাতার মুদ্রিত একটি কবিতা-পত্রিকা বিক্রির জন্য মানুষের সামনে হাত পাতেন মাত্র ৫ টাকা বা ১০ টাকার জন্য তখন বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সুয়োরানি আর দুয়োরানির চেহারা স্পষ্টতই নজরে পড়ে যায়।